সম্পদ পাচার ও পুঁজি সৃষ্টির বিভ্রাট– বাজেট পেরিয়ে দৃষ্টিপাত

সাজ্জাদ জহির

সম্পদ কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে সে আলোচনায় যাব না। যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করার সম্ভাবনা রাখে, এ নিবন্ধে কেবল সেসব সম্পদ গণ্য করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এসব সম্পদের কিছু প্রকৃতি প্রদত্ত (যেমন, জমি), কিছু আগের শ্রমের ফসল (যন্ত্রাদি) এবং বাজার-অর্থনীতির দৌলতে কোনো কোনো সম্পদ আর্থিক সঞ্চয়, যা দিয়ে পূর্বোক্ত দুই জাতের সম্পদের ওপর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। (জোরপূর্বক দখলের কাহিনী এ নিবন্ধে আলোচনা করছি না।) তবে সম্পদের রূপ যাই হোক না কেন, মূল্য সংযোজন ঘটাতে পারলেই তা অর্থনীতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য, যাকে এ নিবন্ধে পুঁজি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, কায়িক বা মনন শ্রমের কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই নতুন মূল্য সৃষ্টি সম্ভব, তাই পুঁজি সৃষ্টির সঙ্গে কর্মসংস্থানের বিস্তার ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কয়েকটি কারণে সম্পদ পাচার ও পুঁজি সৃষ্টির আলোচনার উত্থাপন করছি। সদ্য প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে (২০১২-১৩) এবং তদসংক্রান্ত আলোচনায় 'কর ফাঁকি দেয়া' বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত (কালো) অর্থ তিনটি খাতে বিনা নজরদারিতে 'বিনিয়োগ'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে– অজুহাত, সম্পদ পাচার 'নিরুৎসাহিত' করা। একই সময়ে বিভিন্ন দেশের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটগুলোর সমন্বয়কারী সংস্থা 'এগমন' গ্রুপের সদস্যপদ চাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার সরকারি মনোভাবের প্রকাশ সংবাদমাধ্যমে আমরা জেনেছি। উদ্দেশ্য হিসেবে পাচার করা সম্পদ ফিরিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত হলেও সংস্থাটির কার্যক্রম ঘাঁটলে (www.egmontgroup.org) অতীতে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার কোনো আশ্বাস এ সংস্থাটি দেয় না। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, বাজেটে প্রস্তাবিত নীতিমালা সত্যই কি অর্থ পাচার রোধ করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারবে?

আরও একটি কারণে সম্পদ আলোচনা গুরুত্বের দাবি রাখে। উভয় দেশের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বপরিসরে সম্পদের আঞ্চলিক বিন্যাস ও তার গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন একটি ভূখণ্ডের সমাজ ও অর্থনীতির (এবং একটি জাতির স্বকীয়তা) অটুটতা বা ভঙ্গুরতা নির্ধারণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। অনেকেই অন্তর থেকে অনুধাবন করেন যে, বাংলাদেশ একটি সন্ধিক্ষণে আছে; কিন্তু কিসের সন্ধিক্ষণ, সেটাই আমরা জানি না। এবং তাই, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সীমাহীন অনিশ্চয়তা আমাদের স্পৃহাকে দমিত করছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এসবের বিশদ আলোচনা সংবাদমাধ্যমের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়; নিম্নে কেবল আলোচনার রূপরেখা তুলে ধরেছি।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা পুঁজি সৃষ্টির লক্ষ্যে আগে শেয়ারবাজারে প্রণোদনার কথা শুনেছি এবং প্রস্তাবিত বাজেটে 'কালো' টাকাকে 'কালো' রঙ নিয়েই বিচরণ করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। শেয়ারবাজারের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টির সম্ভাবনা অনস্বীকার্য, তবে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছি। ক্ষুদ্র শেয়ার ক্রেতাদের বিনিয়োগকারী নাম দিলেও মালিকানা বা সম্পদের ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশীদারিত্ব কাগুজে মাত্র। তবে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় শেয়ারবাজারের পথ বেয়ে নিষ্ঠাবান পুঁজিপতি বা বিনিয়োগকারীর হাতে পৌঁছলে সম্পদ তৈরি বা বিরাজমান সম্পদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। অর্থাৎ

শেয়ারবাজার (ব্যাংকিং খাতের বিকল্প ধারায়) অর্থ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে, কিন্তু দেশের মধ্যে হস্তান্তরিত অর্থের (বিনিয়োগ করা) পুঁজিতে রূপান্তর নিশ্চিত করে না। যদি তা বিনিয়োগে রূপ নিত এবং মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে শেয়ারের প্রকৃত দাম বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো, নতুন উদ্যমে এ বাজারে বিনিয়োগকে প্রণোদনা দেয়া যৌক্তিক মনে হতো। কিন্তু শিক্ষার সংস্পর্শে আসা শহরমুখী আমাদের বর্ধিষ্ণু সমাজ তাদের সঞ্চিত অর্থ ও (অনেক ক্ষেত্রে) জীবন খুঁইয়ে জেনেছে যে তা হয়নি। বরং যে বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অর্থ সমাজ ও অর্থনীতিকে চাঙ্গা রেখেছিল, তা শেয়ারবাজারের পথ বেয়ে স্বল্পসংখ্যক ব্যবসায়ীকে ধনী করেছে। শুধু তাই নয়– অনেকে মনে করেন যে, সেই (গুটিকতক ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে পুঞ্জীভূত) সম্পদের শক্তি এতই তীব্র ছিল যে, তা আইনের বাঁধ ভেঙে নিজেকে দেশান্তরিত করতে পেরেছে। যে প্রক্রিয়া সম্পদ পাচারের শক্তিকে জোরদার করে, সম্পদ পাচার রোধের দোহাই দিয়ে সেই প্রক্রিয়াকেই চাঙ্গা করতে প্রণোদনা দেয়ার নীতি, তাই রীতিমতো বিস্ময় জাগায়! তাই নাগরিক মনে শঙ্কা জাগে যে, একই অপশক্তি সম্ভবত বাজেটের রূপরেখা ও রাষ্ট্রের সার্বিক চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করেছে! তবুও বলব, কী কী ব্যবস্থা নিলে শেয়ারবাজারকে দেশজ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা যায়, তা অনুধাবন জরুরি। একই সঙ্গে কালবিলম্ব না করে নজরদারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রতি শেয়ার ক্রেতা-বিক্রেতার (একক বেনিফিসিয়ারি অ্যাকাউন্ট বা মার্চেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী– উভয়ের ক্ষেত্রে) কর পরিচিতি নম্বর (টিআইএন) প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা জরুরি।

সম্পদ পাচারের সঙ্গে 'আর্থিক সন্ত্রাসবাদ' বা 'সন্ত্রাসমুখী মানি লন্ডারিং' গুলিয়ে ফেলে নতুন ধূম্রজাল তৈরী হয়েছে যা আশু অর্থনীতিক দিকগুলোর আলোচনায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সাধারণভাবে আমরা জানি, কোথায় উৎপাদন সংগঠিত হবে তা প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্যতা, সুস্থিরভাবে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার উপযুক্ত (স্থিতিশীল) পরিবেশ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতের সুবিধা-অসুবিধার ওপর নির্ভর করে। সেই সূত্র ধরে এটাও জেনেছি যে, কিছু মৌলিক উপাদান নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে (যেমন জ্বালানি) পুঁজি ও শ্রম উভয় উপাদানই সেদিকে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকাকেন্দ্রিক উন্নয়নধারা সেই সাধারণ রীতির এক প্রকাশ মাত্র। তবে দেশের অভ্যন্তরে শ্রম অবাধে চলাচল করতে পারে, তাই উৎপাদনমুখী স্থায়ী সম্পদ যেখানেই পুঞ্জীভূত হোক না কেন, তা কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখে। তবে এক শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিবেশবান্ধব নয় এবং টেকসই হতে পারে না– সে কারণে উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে কারও মনে সন্দেহ নেই।

আন্তর্জাতিক পরিসরের চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে ভিসা নামক আবিষ্কারের কারণে পুঁজির পিছু পিছু শ্রম অবাধে স্থায়ী ভিত্তিতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলাচল করতে পারে না। সে কারণেই দেশের অভ্যন্তরে পুঁজির বিকাশ গুরুত্ব পায় এবং সম্পদ পাচারকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবুও পুঁজি এক দেশ থেকে অন্য দেশে বেশ সহজেই চলাচল করছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেটাই স্বাভাবিক। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৮ সালে গড়ে প্রতি মাসে ১ লাখেরও বেশি লোক বিমানপথে বাংলাদেশ থেকে চলাচল করেছে এবং ২০১০ সালে তা পৌনে ২ লাখের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এটা আশা করা ভুল হবে যে, দেশে ফিরে এদের প্রতিজন আইনি মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেবেন অথবা বহির্গমনের সময় তা ক্রয় করবেন। নাগরিক জীবন পর্ণাঙ্গভাবে রাষ্ট্রের দাসে পরিণত হওয়া হয়তো কাম্যও নয়। তবে ওইভাবে দেশে আসা বৈদেশিক মুদ্রা পরবর্তী সময়ে অর্থ পাচার সম্ভব করতে আংশিক ভূমিকা রাখে। অবশ্য আইনি পথে

পাচারের তুলনায় এটা কম না বেশি তার সঠিক হিসাব আমার জানা মতে কেউ করেননি। গত বছরের শেষে শেয়ারবাজারে ধস নামার পর বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে অস্বাভাবিকতা আমরা দেখেছি। দীর্ঘ স্থিতিশীলতার পর সে সময় বড় মাত্রায় টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছিল। তখন আমদানি মূল্য অধিক দেখিয়ে (ওভার ইনভয়েসিং) আইনি পথে অর্থ পাচারের কথা শোনা গিয়েছিল। এটাও শোনা গিয়েছিল যে, শেয়ারবাজার থেকে অধিক প্রাপ্তির শক্তি আইনি পথে অর্থ পাচার সুগম করেছিল। রফতানির ক্ষেত্রেও উদ্ধৃত মূল্যের সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাপ্তিতে ফারাক দেখা যায় এবং অনেকে মনে করেন যে, রফতানিকৃত আয়ের কিছু অংশ বিদেশেই জমা রয়ে যায়। আরও একটি পথ রয়েছে, যা আইনিভাবে অর্থের দেশান্তর ঘটাতে পারে, তা হলো বহির্দেশে বিনিয়োগের নামে, যার কিছু দৃষ্টান্ত গত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি।

উল্লিখিত বিবিধ আইনি ও বেআইনি পথে অর্থপ্রবাহের অস্তিত্ব আমরা যদি স্বীকার করে নিই, মানতেই হবে যে, সে প্রবাহ যেকোনো দিকেই বইতে পারে। তবে এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের সমাজের সম্পদশালীরা (এবং যারা ক্ষমতাবলে ভবিষ্যৎ বেছে নিতে পারেন) আর্থিকভাবে উন্নত দেশে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং পরবর্তী বংশধরদের জীবন নিরাপত্তার কথা ভেবে বাইরের দেশে ব্যক্তিসম্পদ গড়ে তুলতে আগ্রহী। এর রাজনীতিক-অর্থনীতিক নিহিতার্থ ভিন্ন পরিসরে আলোচনা করা প্রয়োজন। আপাতত সেটাকে ধর্তব্যে এনেই অর্থপ্রবাহের সাধারণ রীতি ও প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কিছু বিষয় উল্লেখ করব।

সাধারণ চাহিদা জোগানের বাইরে (যার মধ্যে ক্রম বর্ধমান শিক্ষা খরচ মেটানোর চাহিদাও অন্তর্ভুক্ত) দুটো পরস্পরসম্পর্কিত বিষয় অর্থ পাচার বৃদ্ধিতে উল্লেখজনক ভূমিকা রাখে। এর প্রধানটি বিনিয়োগ সুযোগের অভাব, যা ধারাবাহিকভাবে সম্পদশালীদের বহির্মুখী করছে। এর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে জ্বালানি খাতকে নিয়ে অব্যবস্থাপনা, যা স্বাভাবিক জীবনযাপনকেও বিপন্ন করে তুলেছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রজ্ঞার দৈন্য সমাজের যোগ্যদের বহির্মুখী থেকে রসদ জোগায়। এসব কারণ সব সময়ই থাকে, তবে গত বছরগুলোয় তা বেড়েছে। উপরন্তু বিশ্বব্যাপী দীর্ঘকালীন মন্দা রোধে অনেক দেশের সরকার তাদের অভিবাসন দফতরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন জাতের লোভনীয় অভিবাসন প্যাকেজ আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশের বিত্তশালীদের জন্য দিচ্ছেন। এসব কার্যকর করতে গিয়ে তারা আমাদের দেশের আইন লঙ্ঘনে (অর্থাৎ অর্থ পাচারে) বিত্তশালীদের উদ্বুদ্ধ করছে। সেসব ব্যাপারে উৎস দেশের অনুমতি নেয়া তো দূরের কথা, তাদের সঙ্গে তথ্যবিনিময় করা হয় না। অথচ একই সময়ে 'আর্থিক সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে মোর্চা গড়ার নামে এসব দেশই আন্তঃদেশীয় অর্থপ্রবাহের তথ্য বিনিময়ের উপদেশ দিচ্ছে।

বিনিয়োগ সম্ভাবনার মাত্রায় হেরফের না হলেও অর্থ পাচার অস্বাভাবিক বাড়তে পারে এবং সে সম্ভাবনা তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয় যখন বিত্তশালীদের হাতে আকস্মিকভাবে (স্বাভাবিক সময়ের তুলনায়) বেশি অর্থসম্পদ পুঞ্জীভূত হয়। অর্থনীতিক পরিভাষায় বললে, সম্পদ বণ্টনে অসমতা বাড়লে অর্থনীতিতে সে সম্পদ বাড়তি হিসেবে দেখা দেয় (যা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে অর্থনীতি আত্মীভূত করতে পারে না) এবং তা (পানি উপচে পড়ার মতো) বের হওয়ার পথ খোঁজে। দুই দুবার হোঁচট খাওয়ার পর আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ সুযোগ তৈরি না করে কেবল শেয়ারবাজার চাঙ্গা করে মূলত ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের থেকে স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ হস্তান্

রের ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু তা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় না। বরং অর্থ পাচার তীব্রতর হয়, যা ক্রমাগত সমাজ ও অর্থনীতিকে নিঃশেষিত করে। একই সঙ্গে এসবের নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব একটি জাতিকে অথর্ব করে তুলতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমি শেয়ারবাজারকে দুষছি না বরং সেই বাজারকে কার্যকরভাবে বিনিয়োগবান্ধব করতে যেসব পূর্বশর্ত পূরণ প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগের অভাবকে ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করছি। একই সঙ্গে উল্লেখ্য, বিনিয়োগ সুযোগ থাকলেও প্রতিটি বাজারের মতো শেয়ারবাজারেও সুযোগসন্ধানী থাকবে, যারা অনৈতিকভাবে অন্যকে ঠকিয়ে লাভ করতে চাইবে। সে কারণে এ বাজারে সুশাসন নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

আগেই বলেছি, এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থপ্রবাহ আজকের যুগে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এ দেশেরই সন্তান আজ বিভিন্ন দেশে বিচরণ করছে। তাই ভিনদেশের নাগরিক হওয়ার কারণে সম্পদ নিয়ে যাওয়া অথবা সম্পদ নিয়ে গিয়ে নাগরিকত্ব পেতে সচেষ্ট হওয়া একাকার হয়ে গেছে। সাদা-কালোর পার্থক্য টানা আরও দুষ্কর হয়েছে উন্নত দেশের (কিছুটা ভণ্ডামিসুলভ) দ্বৈতনীতি অনুসরণের ফলে। এসবের মধ্যে ভিনদেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কেউ পুঁজি নিতে চাইলে তা আমরা সহজভাবে নিতে পারি না, কারণ তা অর্থ পাচারের উদ্দেশ্যে সহজেই ব্যবহার হতে পারে। দুঃখজনক যে, নিম্ন বিনিয়োগ ফাঁদ থকে বের হওয়ার উদ্যোগ না নিয়ে আমরা বিপরীতমুখী নীতি অনুসরণ করে চলেছি। একদিকে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আমরা অনেক সুবিধা দেয়ার আয়োজন করছি, অন্যদিকে স্থানীয় সম্পদ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে রূপান্তরিত না হয়ে ভিনদেশে পাচার হচ্ছে এবং আমরা সে প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করছি। এসবের মধ্যেও ছিটেফোঁটা বিনিয়োগ হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে ভাগ বসানোর জন্য কিছু নির্দিষ্ট খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটছে। তবে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিতে তার ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য।

বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও তার বাস্তবায়নে ব্যর্থতা নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা যেতে পারে। যে সন্ধিক্ষণের কথা শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম, তা কিছুটা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য বিনিয়োগের দুটো সংঘাতপূর্ণ ধারার বর্ণনা দিয়ে এ নিবন্ধের সমাপ্তি টানব। পূর্বোল্লিখিত সেবা খাতে বিদেশী বিনিয়োগের বাইরে এ দুটো ধারার সংঘাত অতিসন্তর্পণে স্পষ্টতা পাচ্ছে। শিল্পোন্নয়নের চিরচরিত ধারায় অভ্যন্তরীণ শ্রম দ্বারা স্থানীয় বা আমদানি করা উপকরণ ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির পথটিকে মোটা দাগের প্রথম ধারা হিসেবে চিহ্নিত করছি। এ ধারারও ন্যূনতম দুটো উপধারা রয়েছে– ক. প্রথমটির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গার্মেন্টসে, যা দেশের বাইরে থেকে অধিকাংশ উপকরণ আনে এবং স্থানীয় শ্রম ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপন্ন করে তা বাজারজাত করতে দেশের বাইরের ভোক্তাদের ওপর (রফতানি) নির্ভরশীল; খ. দ্বিতীয় উপধারায় উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরে বাজারজাত করা হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বেসরকারি খাতে এ জাতীয় বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড সঞ্চালন করার জন্য অবকাঠামোয় বিনিয়োগ সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। সাধারণভাবে, শ্রমঘন শিল্প গড়ে তুলতে শ্রমিকের অবস্থান বিবেচনায় আনলে অবকাঠামোর জাল অনেক বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উন্নয়নশীল অনেক দেশই উপযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণের পথ নিয়ে নিজ দেশে অনেক প্রবৃদ্ধি অঞ্চল গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশ দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে পথ নেয়নি এবং দুঃসহনীয়ভাবে সব ভার ভিড় জমেছে ঢাকার ওপর। এর নেতিবাচক সমাজতাত্ত্বিক প্রভাব বুঝতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, বিশেষত সমাজ বাঁধুনির অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় আজ পর্যন্ত দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তবে

অনেকে আশা করেছিল যে, বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে হয়তো ঢাকাকেন্দ্রিক বিনিয়োগ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে (ন্যূনতম, গুটিকতক শহরে) ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু বর্তমান সন্ধিক্ষণে তা অনিশ্চিত (অথবা নিশ্চিতভাবেই হওয়ার নয়)!

আমাদের পথযাত্রায় আকস্মিকভাবেই দ্বিতীয় ধারার বিনিয়োগ প্রয়াস অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে। এই দ্বিতীয় ধারার বিনিয়োগ আসছে আঞ্চলিক সংযুক্তীকরণের নামে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ আহরণকে কেন্দ্র করে। এসবের প্রয়োজনে যে অবকাঠামো প্রয়োজন তা দেশের শ্রম ব্যবহারে সর্বোত্তম পথ খুঁজতে আগ্রহী নয়, এমনকি স্থানীয় ভোক্তাদের দ্বারে দ্বারে পণ্য সুলভে পৌঁছে দিতে রাস্তাঘাটে খরচ করা যৌক্তিক মনে করে না। ঢাকার নাগরিকদের জীবনধারাকে উন্নত করতে মেট্রো রেল ট্রানজিট এ ধারায় গুরুত্ব পাবে না, বরং এ শহরের দুর্লভ জমি ব্যবহার করে আঞ্চলিক পণ্য চলাচল দ্রুত করার উদ্দেশ্যে এক্সপ্রেস ওয়ের প্রয়োজন এখানে অধিক এবং দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা আঞ্চলিক রাস্তাঘাটের ওপর নজরের মাত্রা নির্ভর করবে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সরবরাহ করা কৃষিপণ্যের গুরুত্বের ওপর। দৃষ্টিকে আরও সুদূরপ্রসারিত করতে চাইলে নন-রিনিউঅ্যাবল (নবায়ন অযোগ্য) জ্বালানি আহরণের সময় অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ও পরিণতি দ্রষ্টব্য। এবং সে রূপরেখায় আবাসনের উদ্দেশ্যে স্যাটেলাইট শহর গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকৃত গ্রোথ সেন্টার (প্রবৃদ্ধি অঞ্চল) গড়ে উঠতে পারে না, যা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং নতুন সামাজিক বাঁধন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবে।

যেভাবে বিশ্বায়নের মন্দ দিকগুলো জানা সত্ত্বেও সেই অদৃশ্য শক্তিকে আমরা রুখতে পারিনি। একইভাবে আমাদের খনিজ ও জ্বালানিসম্পদ আহরণে একক স্থানীয় কর্তৃত্ব স্থাপন হয়তো দুরূহ এবং আঞ্চলিক সংযুক্তির চাহিদার প্রতি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে নেতৃত্বের প্রজ্ঞার অভাব থাকলে বিশাল কাঠামোর নিচে শূন্যতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়বে, যা একপর্যায়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও ক্ষমতাকেই অপ্রয়োজনীয় করে তুলবে। সম্পদ আহরণকালে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নামে আমরা স্বল্প পরিমাণ 'ভিক্ষা'য় সন্তুষ্ট থাকতে পারি (যা নিশ্চিত অবক্ষয় ডেকে আনবে), আবার চাইলে দরকষাকষি করে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে সচল করতে উদ্যোগী হতে পারি। প্রতিরোধের ভয়ে (যার সঙ্গে আমরা সন্ত্রাসবিরোধী আধিক্যকে প্রাধান্য দিচ্ছি) আমরা অনুপবেশকারী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যা কিছু স্থানীয় তা গুঁড়িয়ে ফেলতে উদ্যোগী হতে পারি অথবা দেশীয় সংস্থাকে সুসংহত করে বৃহত্তর জোটে একত্রিত করে দেশ ও জনগণের স্বার্থের অনুকূলে সেই দরকষাকষি করতে পারি। সত্যিই এই সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেম অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু তাকে সহায়তা করতে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ কি আর দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য নিয়ে আছে?

লেখক: গবেষণা পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)